করবে। চাই কী সুযোগ পেলে আরও কিছু করবে — কেউ বাধা দেবে না।

কিন্তু দুনীর পারে মানে — কোথায় থাকো তুমি?'

'সতুগড়াতে।'

'সতুগড়া — সে তো অনেক দূর!'

'না, স্যার — খুব একটা দূর না, সাইকেলে আধঘণ্টা লাগে।'

'সাইকেলে মানে! তুমি কি এখনও সাইকেলে যাতয়াত করো নাকি? আরে তুমি এমবিএলের অফিসার, এনভাইরনমেন্ট কোঅর্ডিনেটর, শিফট ইঞ্জিনিয়ার র‍্যাঙ্ক। তোমার কি এখনও সাইকেল চড়ে প্ল্যান্টে আসা মানায় নাকি? ওয়ার্কমেনরাই এখন কত দামি দামি বাইক ইউজ করছে। সেখানে তুমি সাইকেল!

নাঃ মানায় না — একদমই শোভা পায় না। বাইক না পারো ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে একটা স্কুটি কিনে নাও। বলো তো আমি ব্যবস্থা করে দেব। অল্প ইএমআই-তে কোনও অসুবিধাই হবে না।

কিন্তু ওখানে কী তোমাদের নিজের বাড়ি না ভাড়ায় থাকো?'

'না স্যার, নিজেদের বাড়ি। আমার মায়ের বাবা বানিয়েছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর আমি ওখানেই মানুষ। এখন তো মাও মারা গিয়েছেন।'

তারিখেই সব ক'টা আউটলেটে সেপারেটর বসানোর কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল। বেলা চারটের সময় সুশীল পাল সব কিছু কমলকে বুঝিয়ে কাজটা হ্যান্ডওভার করে দিল। এ ক'দিন ওদের খুব খাটুনি গিয়েছে। সকাল থেকে কাজ আরম্ভ করে শেষ করতে করতে সন্ধে পার হয়ে গিয়েছে। পরিশ্রম কমলেরও হয়েছে। সারাক্ষণ ওদের সঙ্গে থেকে হাতে হাত লাগিয়ে কাজ উদ্ধার করেছে।

ঠিক হল নতুন বছরের প্রথমদিনই ওগুলোকে লাইনে দেওয়া হবে। আশিস ঘোষই ঠিক করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় মুম্বই থেকে ফিরে কাজটা দেখে খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বাঃ, এতো দারুণ। পঁচিশ ঘণ্টা করে ওভারটাইম নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সুশীল পাল একেবারে চ্যাম্পিয়ন। কী চমৎকার কাজ করেছে দেখ? যেমন সুন্দর গেটআপ তেমনই ফিনিশিং, কে বলবে এগুলো সব স্ক্র্যাপ থেকে তৈরি!

কিন্তু ট্রায়াল রান নিয়েছ — সবগুলোকে চালিয়ে দেখেছ তো?'

'হ্যাঁ দেখেছি।' কমল বলল। ওকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাল।

'তবে আর কী, কাল সকালেই তা হলে এগুলো চালু করে দাও। তারপর

ঠিক হল নতুন বছরের প্রথমদিনই ওগুলোকে লাইনে দেওয়া হবে। আশিস ঘোষই ঠিক করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় মুম্বই থেকে ফিরে কাজটা দেখে খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বাঃ, এতো দারুণ। পঁচিশ ঘণ্টা করে ওভারটাইম নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সুশীল পাল একেবারে চ্যাম্পিয়ন। কী চমৎকার কাজ করেছে দেখ? যেমন সুন্দর গেটআপ তেমনই ফিনিশিং, কে বলবে এগুলো সব স্ক্র্যাপ থেকে তৈরি

'তা হলে তোমার সঙ্গে আর কে থাকে — তোমার স্ত্রী?'

'স্ত্রী কোথায় পাব স্যার — আমার তো বিয়েই হয়নি। আমি একাই থাকি।'

'তা বিয়েই যখন করোনি তখন আর অসুবিধা কী — ফালতু ওখানে পড়ে আছ কেন? বাড়িটাকে বিক্রি করে দাও, নয়তো ভাড়া বসাও। দিয়ে গান্ধীনগরের দিকে চলে এস। তোমাদের ওদিকের চেয়ে এদিকের পরিবেশ অনেক ভালো। আর বলো তো কলোনিতে একটা ফ্ল্যাট অ্যালট করে দিই। অবশ্য আলটিমেটলি তাই-ই হবে — কোম্পানি সবাইকে কলোনিতেই ঢোকাবে। কোম্পানিরও বা দোষ কী, কলোনিতে ফ্ল্যাটের পর ফ্ল্যাট খালি থাকবে আর কোম্পানি তোমাদের হাউস রেন্ট দিয়ে যাবে, সেটাও তো আর হয় না। এতে তো কোম্পানির লস — এই লসটা কোম্পানি দিনের পর দিন সহ্য করবে কেন?

তা ছাড়া কলোনিতে আশিস আছে, অর্ক আছে, আরও অনেকে আছে। তেমনি সুবিধাও আছে। চব্বিশ ঘণ্টার জল, অফুরন্ত ইলেকট্রিসিটি — সিকিউরিটি। টিভির জন্যে ফ্রি কেবল লাইন। খাওয়া দাওয়ার জন্যে মেসও আছে। তোমাদের মতো ব্যাচেলারদের পক্ষে সেটাও একটা বড় সুবিধা।

আর তুমিও এখন এমার্জেন্সি স্টাফ, যখন তখন — এমনকি মাঝরাতেও প্ল্যান্টে তোমার ডাক পড়তে পারে। তখন মাঝরাতে কে তোমায় ওই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে পিক আপ করতে যাবে? কোনও ড্রাইভারই রাজি হবে না। অত রাতে তুমিও সাইকেল করে আসতে পারবে না। মাঝখান থেকে প্ল্যান্ট সাফার করবে।'

... ...

দিন দশেক না, ডিসেম্বরের একতিরিশ

এমডিকে ফোন করে জানিয়ে দাও।'

'আমি জানাব?' কমল জিজ্ঞাসা করল। একটু যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেল। 'কিন্তু আমার কি ফোন করাটা ঠিক হবে?'

'কেন, ঠিক হবে না কেন?' আশিস ঘোষ বললেন। এবারে যেন বিরক্ত হলেন।

'না, উনি এমডি — আর আমি একটা সাধারণ কর্মচারী।'

'তো, সাধারণ কর্মচারী তো? কাজটা করেছ তুমি, ডিজাইনটাও তোমার! তুমি জানাবে না তো কে জানাবে? তা ছাড়া উনি নিজে তোমায় ফোন করতে বলে গিয়েছেন। পঁচিশ তারিখে এখানে এসেও তোমার খোঁজ করেছিলেন। আমি ছিলাম না ঠিকই তবে সবই আমার কানে এসেছে। তাই তুমিই ফোন করবে। একদম ভয় পাবে না — স্মার্টলি কথা বলবে। বলবে, স্যার কাজটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আপনি আমায় এক মাস সময় দিয়েছিলেন, কিন্তু এক মাস নয়, আমি একুশ দিনের মধ্যেই কমপ্লিট করে দিয়েছি। একুশ দিন কথাটা অবশ্যই মেনশান করবে — ওটার ওপর জোর দেবে, একদম ভুলে যাবে না।

আর সব ডেটাও একদম রেডি রাখবে। উনি কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, ডেটা সব রেডিই আছে, তবে আপনাকে একবার দেখিয়ে নেব। আপনার আইডিতে মেল করে দিচ্ছি — আপনি বাড়িতে বসেই দেখে নেবেন।'

'সেই ভালো। ওঃ এবারে মুম্বইয়ে যা কষ্ট পেয়েছি না — যেমন গরম তেমনই ঝামেলা। সারাদিন পার্টির সঙ্গে দেখা করার জন্যে হোটেলের লাউঞ্জে হাঁ করে বসে থাকা।

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ অভি

রসেবশে

মানুষ

প্রতিম বসু

মানুষ চেনা যে সহজ নয় সে কথা তো কবে থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু শুনলেই তো হল না, সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যে প্রমাণ দরকার। সেটা পাওয়া গেল ভোমলা জন্মানোর পরে।

নার্সিং হোমে, অ্যাকোরিয়ামের মতো কাচের বাক্সে, পাশাপাশি শোয়ানো গোটা ছয়েক ছানা আর বাক্স ঘিরে ভিজিটিং আওয়ার্সে চিড়িয়ানার মতো দর্শক। তার ভিতর আমার শ্বশুর-শাশুড়িও এবং নানা রকমের পিস-মাস শাশুড়িও আছে। সবাই মিলে একসঙ্গে ফিসফাস করছে, ফলে বেজায় গোলোযোগ — চিড়িয়াখানায় যেমন হয়। খালি ছোলা-বাদামওয়ালাটাই নেই, তার বদলে আমি আছি। বেজার মুখ করেই আছি অবশ্য। বলছে ছেলে হয়েছে, কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় দেখতেই পাচ্ছি না। ওদিকে শ্বশুরবাড়ির রায় বেরিয়ে গিয়েছে, নাক, কান, মুখ সব নাকি ঠিক ওঁদের মেয়ের মতো।

হিংসেতে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে রোগা, মোটা, সরু নানা রকম মহিলার বেড়া টপকে ঢুকে পড়েই অবাক ঃ এ কীরে বাবা, চিনল কী করে কোনটা কার বাচ্চা! পায়ে একটা করে নম্বর লাগানো তাই রক্ষে, নইলে, ইয়ে মানে মানুষের সঙ্গেই তো তেমন মিল পাচ্ছি না। বরং, ইয়ে মানে বাঁদরের বাচ্চার সঙ্গেই বেশি মিল। তাতে আমার তেমন আপত্তি ছিল না। ছোট থেকেই তো শুনছি 'বাঁদর'। কিন্তু মনের কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতেই দেখি, ক'দিন আগেই জামাইষষ্ঠীতে ডেকে যে সব আহ্লাদ করেছিল, সেগুলো স্রেফ গ্যাস! বাগে পেয়েই যাচ্ছেতাই কী সব বলল। মানুষ চেনা সম্ভব না।

চেনা নিয়ে অবশ্য আমার এমনিতেই একটু সমস্যা আছে। রাস্তাঘাটে লোকে তাকালে, আমিও হাসি। কেন হাসছি, না বুঝেই হাসি। হাসি না পেলেও হাসি। কারণ ওই যে, বুঝতে পারি না চিনি কিনা! সেটা তো আর বাইরের লোককে জানতে দেওয়া যায় না! রানিগঞ্জ স্টেশনে একবার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মিনিট দশেক কথা বলে বোঝা গেল কেউ কাউকে চিনি না। উনি কোনও কারণে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, আমি ভেবেছি চেনা, তাই উত্তমকুমারের মতো হেসেছি। উনিও দমবার পাত্র নন। উত্তরে সৌমিত্রের মতো হেসেছেন। হাসাহাসি শেষ করে, দু'জনেই সন্তর্পণে দাবার চালের কথা বলাবলি করেছে। যেমন, 'এদিকে কেন?' কিংবা 'কোথায় চললেন'? শেষমেশ হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ার পর দু'জনেই চা-ঝালমুড়ি খেয়েছি।

তবে মাঝে মাঝে খুব বেকায়দায় পড়তে হয়। এক বন্ধুর বউকে অনেকদিন বাদে দেখে চিনতে পারিনি। যেই না হেসেছি, সে পট করে ধরে ফেলেছে। খালি বলে 'বলুন তো কে?' কী মুশকিল! অত সুন্দরী মহিলা আমায় চেনে, এদিকে আমিই চিনি না?

এগুলো তো ভালো। এর থেকেও বড় সমস্যায় পড়েছিলাম অসীমের বাবাকে নিয়ে। ডিউটি না থাকলে, কাকুর একটাই ডিউটি ঃ খালি গায়ে, গামছা পরে বাড়ি আর বাগানের তদারক করা। গামছায় আবার একটা ফুটো। কারণে, অকারণে বন্ধুর বাড়ি যাওয়া আসা। কাকুর ড্রেসের পরিবর্তন দেখিনি কোনওদিন। হটাৎ একদিন ট্রেনে দেখি প্যান্ট-শার্ট পরিহিত এক ভদ্রলোক কটমট করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। উত্তমমার্কা হাসি দিতেই এই মারেন কি সেই মারেন। 'এতক্ষণ ধরে চিনতে পারছ না, আবার দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট খাওয়া হচ্ছে?' আরে এ কী, এ তো অসীমের বাবা! যেই বলেছি 'কাকু আপনার গামছা', অমনি চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একসা। আমি নাকি গুরুজনের গামছা তুলে কথা বলেছি। কী আশ্চর্য!

তবে কিছু মানুষ চেনা অসম্ভব। অফিসের সহকর্মীদের কথা বলছি না। ওঁরা সব জীনানন্দের কবিতা। স্যুরয়ালিস্টিক কাক, শালিক। ফেসবুকও বলতে পারেন, ফেস আর বুকের মধ্যে যোগাযোগ নেই। 'ডার্ক ওয়েব' ভেবে এড়িয়ে চলাই ভালো। মুশকিল হয় তাদের নিয়ে, যাদের চিনতেই চাইনি।

বছর ছয়েক আগের কথা। খবর করব বলে, কোচবিহার জেলার মধ্যে টুকরো টুকরো বাংলাদেশের ছিটমহল দেখে বেড়াচ্ছি। একটা বাংলাদেশি ছিট পেরিয়ে বিএসএফ-র ক্যাম্পে যাব। আগের দিন দিনহাটায় বিডিওকে পটিয়ে লাইন করে এসেছি। কিন্তু যাব বললেই তো আর হল না। গ্রামের রাস্তা চিনতে ঘাম ছুটে যায়। সিরাজুল যাচ্ছিল হেঁটে হেঁটে। জিজ্ঞেস করতেই গাড়িতে উঠে এল। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সাঁই-সাঁই করে পৌঁছে দেখি কেলো। বিএসএফ লম্বা লম্বা স্যালুট আর লাঞ্চ নিয়ে রেডি। বড় সরকারি অফিসার ভেবেছে। দশ মিনিটেই ভান্ডা ফোট। প্রশ্নের ধরন দেখেই বিএসএফ কম্যান্ডারের ভুরু কুঁচকে গেল। মিডিয়া-পরিচয় পেতেই লাঞ্চের অর্ডার ক্যানসেল। রিপোর্টার আর নেড়ি কুকুরে কোনও তফাৎ নেই। ডান্ডার ভয়ে আমি সুড়ুৎ করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। ভেবেছিলাম পথে সিরাজুলকে নামিয়ে চলে যাব। হাতে পঞ্চাশ-একশো গুঁজে দিতে চাইলাম। ল্যাংবোট-গিরির দাম। কিছুতেই নেবে না। ঝুলোঝুলি করে ছিটমহলে দরমার বাড়িতে নিয়ে গেল।

ছিরকুটে গরিব। ইস্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। জমিজমা বলতে ওই দু'এক ছিটে, তাতে এক মাসের ভাতও হয় কিনা সন্দেহ। 'গরমেন্ট' নেই বলে ছিটমহলে ফাটিয়ে গাঁজার চাষ হত। সিরাজুলের জ্ঞাতিগুষ্ঠিও করে, দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সিরাজুল পাপ করবে না। কাজ করবে। এদিকে ছিটমহলে কাজ নেই, আর বাইরে গেলে পুলিশ ধরবে। সিরাজুল দু'বার ধরা পড়েছে, বাংলাদেশি বলে জেলে থেকেছে।

কথাবার্তার মাঝেই দেখেছি বাড়ির লোক হন্তদন্ত হয়ে এপাশে-ওপাশে ছড়িয়ে থাকা গাঁজা-গুষ্ঠির বাড়ি যাচ্ছে, আসছে। কারণটাও হাতে হাতেই এসে গেল। এক গ্লাস গরম চা। স্টিলের গ্লাসটা ঝকঝকে করে মাজা। চা, দুধ, সবই বোধহয় গণ্যমান্য অতিথির জন্যে চেয়েচিন্তে আনা। সব পাই-পয়সায় মেটাতে হবে। মেটাতে গেলে আবার প্রাণ হাতে করে ছিট থেকে বেরোতে হবে।

চা শেষ করে উঠতে যাচ্ছি, বাবা, মা, ভাইবোন সমেত গোটা সিরাজুল বাড়ি পায়ে পড়ার জোগাড় ঃ একটু ভাত খেয়ে যান। মুরগির মাংস দিয়ে গরম ভাত। খিদে পেয়েছিল খুব, কিন্তু আমি ভাত খাইনি। টাকার কথা তুলতে পারিনি। কথা দিয়েছিলাম ওদের ছিট ভারতবর্ষ হলে আসব। সে কথাও রাখতে পারিনি। সিরাজুলরা কি এখন দারচিনি-গন্ধ মুরগির ঝোল দিয়ে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত খেতে পায়!

অঙ্কন ঃ অভি